Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অমুসলিমদের সাথে আচরণ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারজানা ইয়াসমিন

রোলঃ 216021627

৩১ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অমুসলিমদের সাথে আচরণ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারজানা ইয়াসমিন

রোলঃ 216021627

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "অমুসলিমদের সাথে আচরণ" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফারজানা ইয়াসমিন, আইডিঃ 216021627 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " অমুসলিমদের সাথে আচরণ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

- আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

ফারজানা ইয়াসমিন

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৪ ইং

ফারজানা ইয়াসমিন

আইডিঃ 216021627

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

★ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আমরা মহান আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি।মহা মহিমাময় আল্লাহ তায়ালা জীন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তার ইবাদত করার জন্যে।কিন্তু এই মানবজাতি আজ বিভিন্ন ধর্মে বিভক্ত।

আমরা পৃথিবীর সব মানুষকে বিশ্বাসের দিক থেকে চার ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথমত আল্লাহ এবং শেষ নবীকে মানে অর্থাৎ মুসলিম। দ্বিতীয়ত যারা আল্লাহকে মানে এবং শেষ নবী মোহাম্মদ (সা.) কে না মেনে পূর্বের কোনো নবীকে মানে যেমন, ইহুদি, খ্রিষ্টান ইত্যাদি। তৃতীয়ত যারা আল্লাহ ও নবী কাউকে না মেনে অন্য কোনো বস্তু বা দেবতার পুজা করে যেমন হিন্দু, বৌদ্ধ ইত্যাদি। চতুর্থত যারা কোনো ধর্ম মানে না। যেমন নাস্তিক। এ মৌলিক চার প্রকারের প্রত্যেক প্রকারে অনেক দল ও গোষ্ঠী রয়েছে। এখন যারা ইসলাম ধর্ম পালন করে তাদের সাথে অন্যান্য ধর্ম, মত ও পথের অনুসারীদের সাথে সম্পর্ক কেমন হবে তার মৌলিক বিধানে আল্লাহতায়ালা বলছেন
, ‘তোমাদের সেই লোকদের সাথে ভালো ও সুবিচারমূলক আচরণ গ্রহণ করতে নিষেধ করছেন না, যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের ঘর থেকে তোমাদের বহিষ্কৃত করেনি। আল্লাহ তো সুবিচারকারীদের পছন্দ করেন। তিনি তোমাদের বিরত রাখছেন শুধু এ থেকে যে, তোমরা বন্ধুত্ব করবে না তাদের সাথে, যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে ও তোমাদের ঘর থেকে তোমাদের বহিষ্কৃত করেছে এবং তোমাদের বহিষ্কৃতকরণে পরস্পরের সাথে সহযোগিতা করেছে। এ লোকদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করবে তারাই জালিম।’ (সুরা মুমতাহিনা, আয়াত-৮, ৯)

আল্লাহ তা'আলার কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম হলো ইসলাম। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

اِنَّ الدِّیۡنَ عِنۡدَ اللّٰہِ الۡاِسۡلَامُ

“নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ইসলামই হচ্ছে একমাত্র মনোনীত দ্বীন (আনুগত্যের বিধান বা জীবন ব্যবস্থা)।” (সুরা আল ইমরান, আয়াত ১৯)

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

وَ مَنۡ یَّبۡتَغِ غَیۡرَ الۡاِسۡلَامِ دِیۡنًا فَلَنۡ یُّقۡبَلَ مِنۡہُ ۚ

কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবুল করা হবে না। (সুরা আল ইমরান, আয়াত ৮৫)

পৃথিবীতে এখন বিভিন্ন ধর্ম বিরাজমান।মানুষ এক আল্লাহর থেকে দূরে গিয়ে বিভিন্ন শিরকে লিপ্ত হচ্ছে। মুসলিম-অমুসলিমের সমন্বয়ে চলছে পৃথিবী।

কোনো মুসলিমপ্রধান দেশে অমুসলিমদের বসবাস কিংবা কোনো অমুসলিমপ্রধান দেশে মুসলমানদের বসবাস এখন বিচিত্র কিছু নয়। সমাজে চলাফেরা, জীবনযাপন করতে গিয়ে মুখোমুখি হতে হয় অমুসলিমদেরও। অমুসলিম ব্যক্তি হতে পারে কোনো মুসলমানের প্রতিবেশী। লেনদেন ওঠাবসা চলাফেরা সাহায্য-সহযোগিতা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে একজন মুসলমান ও একজন অমুসলমানের সাক্ষাত হতে পারে।

ইসলাম অমুসলিমদের সাথে আচরণে ভদ্রতা ও সৌজন্য রক্ষা করার নির্দেশনা দেয়। যদি কারও কোনো প্রতিবেশী কিংবা কোনো আত্মীয় অমুসলিম হয়, ইসলামের নির্দেশনা

হল- তার সাথেও প্রতিবেশী বা আত্মীয়ের হক রক্ষা করে চলতে হবে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এ দুটি সম্পর্ক রক্ষা করার ওপর যথেষ্ট জোর দেয়া হয়েছে।

★অমুসলিম কারা?

মুসলমান বা মুসলিম (আরবি:مسلم-অর্থ: স্ব ইচ্ছায় আত্মসমর্পণকারী, অনুগত) হলো সেই লোক যে নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে।অতএব, যে নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহ তায়ালার কাছে আত্মসমর্পণ করে শান্তি অর্জন করেছে তাকে মুসলিম বলে। সুতরাং একজন মুসলিম আল্লাহ তায়ালার কথামতোই জীবনযাপন করে এবং একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই ইবাদত করে। আল্লাহ তা'আলাকেই একমাত্র উপাস্য এবং ইলাহ হিসেবে স্বীকার করে এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে আল্লাহর প্রেরিত রাসুল হিসেবে স্বীকার করে।

আর যারা এর অন্তর্ভুক্ত নয়,তারা অমুসলিম।অর্থাৎ যারা ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্ম পালন করে তাদেরকে অমুসলিম বলা হয়।

★অমুসলিমদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্কের সীমারেখা

“যারা অবাধ্যতার পথ অবলম্বন করেছে তারা একে অন্যের বন্ধু। তোমরা যদি এরূপ (মুমিনদের বন্ধুত্ব সুদৃঢ়) না করো, তবে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে এবং বড় ধরনের বিপর্যয় দেখা দেবে।”

(সুরা : আনফাল, আয়াত : ৭৩)

ইসলাম একমাত্র জীবনব্যবস্থা, যারা বিশ্বসমাজ গড়ে তোলার মতো ঔদার্য ও সামর্থ্য আছে। ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে একটা বৃহৎ সমাজ গঠনের সব উপাদান ইসলামের আছে।

এই ধর্মে আহলে কিতাব, মুসলমান ও একই রাষ্ট্রে বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে আচার-ব্যবহার ও সামাজিকতার ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য নেই। মাংস ছাড়া অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে আহলে কিতাব (ইহুদি-খ্রিস্টান) ও অন্যান্য কাফিরের মধ্যে কোনো তারতম্য নেই। অর্থাৎ পরস্পরে একে অন্যের (হালাল) খাবার গ্রহণ করতে পারবে।

মাংসের ক্ষেত্রেও আহলে কিতাব ও মুসলমানদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কোনো হালাল প্রাণী আহলে কিতাবের কেউ জবাই করলে মুসলমানদের জন্য সেটা আহার করা বৈধ। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা পুরোপুরি নিশ্চিত করা হয়। এ ছাড়া ইসলাম তাদের সঙ্গে সামাজিক অংশীদারি, সৌজন্যবোধ ও মেলামেশার সুযোগ দিয়েছে। ইসলাম ধর্ম মতে, বৈধ যেকোনো বস্তু অমুসলিমদের সঙ্গে বেচাকেনা করা বৈধ। এমনকি আহলে কিতাবের রমণীদের বিয়ে করা বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অমুসলিমদের ধর্মীয় উপাসনালয়গুলো যেন কারো কুদৃষ্টির কবলে না পড়ে সে জন্য মুসলমানদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহ যদি মানবজাতির এক দলকে অন্য দল দিয়ে প্রতিহত না করতেন, তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রিস্টান সংসারবিরাগীদের উপাসনার স্থান, গির্জা, ইহুদিদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ-যার মধ্যে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়।' (সুরা : হজ, আয়াত : ৪০)

তবে এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে ইসলাম একটি পৃথক ধর্ম। তাই আত্মীয়তা, ঘনিষ্ঠতা ও সামাজিকতার ক্ষেত্রে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মধ্যে কিছু পার্থক্য ধরে রাখা হয়েছে। যেমন আহলে কিতাবের নারীদের বিয়ে করা মুসলমানদের জন্য বৈধ বটে; কিন্তু আহলে কিতাব কোনো পুরুষের সঙ্গে মুসলিম নারীদের বিয়ে বৈধ নয়। আহলে কিতাব ছাড়া অন্যান্য ধর্মের লোকদের সঙ্গে কোনো ধরনের বৈবাহিক সম্পর্ক বৈধ নয়। মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে ওয়ারেশি সম্পদের বণ্টননীতি প্রযোজ্য হবে না। কোনো অমুসলিমকে একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু বানানো যাবে না। কেননা এসবের অনুমতি দেওয়া হলে মুসলমানদের সামাজিক শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হবে। ধর্ম পরিচয়ে সংকট তৈরি হবে। ধর্মীয় বন্ধন হালকা হয়ে যাবে।

★অমুসলিমদের সাথে আচরণে ইসলামের নির্দেশনা

সাহাবী হযরত জাবের রা. বর্ণনা করেন, একদিন আমাদের পাশ দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর দেখাদেখি আমরাও দাঁড়ালাম। আমরা তাঁকে বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ তো এক ইহুদির লাশ!' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যখন কোনো লাশ নিতে দেখবে, তখন দাঁড়াবে।' -সহীহ বুখারী, হাদীস : **১৩১১**

আরেক হাদীসে এসেছে, হযরত সাহল ইবনে হুনাইফ ও হযরত কায়েস ইবনে সাদ রা. একদিন বসা ছিলেন। তারা তখন কাদিসিয়ায় থাকেন। পাশ দিয়ে একটি লাশ নেয়া হচ্ছিল। তা দেখে তারা দুজনই দাঁড়ালেন। উপস্থিত লোকেরা তাদেরকে জানাল, 'এ এক অমুসলিমের লাশ।' তাঁরা তখন শোনালেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়েও একবার এক লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তিনি যখন তা দেখে দাঁড়ালেন, উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম তখন বললেন, এ তো ইহুদির লাশ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, أليست نفسا অর্থাৎ 'সে মানুষ ছিল তো?' -সহীহ বুখারী, হাদীস : **১৩১২**

অমুসলিমদের সাথে আচরণে ভদ্রতা ও সৌজন্য রক্ষা করার জন্যে ইসলাম যে উদার নির্দেশনা দেয়, উপরোক্ত হাদীসটিই তার প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট।

সমাজবদ্ধভাবে জীবনযাপন করতে গিয়ে নানা শ্রেণির নানা পেশার নানা মত ও পথের মানুষের মুখোমুখি হতে হয়। মুখোমুখি হতে হয় অমুসলিমদেরও। লেনদেন ওঠাবসা চলাফেরা সাহায্য-সহযোগিতা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে একজন মুসলমান ও একজন অমুসলমানের সাক্ষাৎ হতে পারে। কোনো মুসলিমপ্রধান দেশে অমুসলিমদের বসবাস কিংবা কোনো অমুসলিমপ্রধান দেশে মুসলমানদের বসবাস এখন বিচিত্র কিছু নয়।

অমুসলিম ব্যক্তি হতে পারে কোনো মুসলমানের প্রতিবেশী। কোনো অমুসলিম যদি পুরনো ধর্ম ছেড়ে ইসলামের শীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়, তাহলে তো আরও অনেক অমুসলিমের সাথে তার আত্মীয়তার সম্পর্কও থাকবে। বর্তমান সময়ে পৃথিবীতে যেভাবে দলে দলে অমুসলিম ইসলামের ছায়াতলে আসছে, তাতে এ বিষয়টি খুবই প্রাসঙ্গিক।

ইসলামে অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিধানও দেয়া হয়েছে- এ কথা ঠিক, তবে এও অনস্বীকার্য যে, যুদ্ধের ময়দানের বাইরে তাদের নিরাপত্তাদান, তাদের সাথে সৌজন্য বজায় রেখে উত্তম আচরণের কথাও বলা হয়েছে। এমনকি যুদ্ধের মাঠেও যেন অমানবিক আচরণ করা না হয়, যারা যুদ্ধে অংশ নেয়নি তাদেরকে, বিশেষত নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের ওপর যেন হামলা করা না হয়- এ আদেশও দেয়া হয়েছে।

ইসলামী রাষ্ট্রে যে সকল অমুসলিম রাষ্ট্রীয় নিয়মকানুন মেনে বসবাস করবে, তারা সেখানে পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে নিরাপদ জীবন যাপন করবে। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তারা তাদের নির্ধারিত সকল হক পাবে। সন্দেহ নেই, রাষ্ট্রের শান্তিশৃংখলা বজায় রাখার জন্যে এ বিধানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

হজরত সুফিয়ান ইবনে সালিম রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘জেনে রেখ! কোনো মুসলিম যদি অমুসলিম নাগরিকের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন করে, তার কোনো অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করে, তার কোনো জিনিস বা সহায়-সম্পদ জোরপূর্বক কেড়ে নেয়; তবে কেয়ামতের দিন আল্লাহর বিচারের কাঠগড়ায় আমি তাদের বিপক্ষে অমুসলিমদের পক্ষে অবস্থান করব।’ (আবু দাউদ)। হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেছেন, ‘যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোনো অমুসলিমকে হত্যা করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন।’ (মুসনাদে আহমাদ)

হযরত উমর রা.-এর একটি ঘটনা। তিনি তখন খলীফাতুল মুসলিমীন। একদিন এক ইহুদি বৃদ্ধকে দেখলেন মসজিদের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে বেড়াতে। তখন তিনি ইহুদিকে লক্ষ করে বললেন,

مَا أَنْصَفْنَاكَ إِنْ كُنَّا أَخَذْنَا مِنْكَ الْجِزْيَةَ فِي شَبِيبَتِكَ، ثُمَّ ضَيَّعْنَاكَ فِي كِبَرِكَ. قَالَ: ثُمَّ أَجْرَى عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مَا يُصْلِحُهُ

আমরা তোমার ওপর ইনসাফ করতে পারিনি যদি তোমার যৌবনে আমরা তোমার নিকট থেকে জিযয়া গ্রহণ করে থাকি আর তোমার বার্ধক্যে তোমাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেই। এরপর তিনি তার জন্যে বায়তুল মাল থেকে প্রয়োজনীয় ভাতার ব্যবস্থা করে দেন। -কিতাবুল আমওয়াল, ইবনে যানজূয়াহ্, ১/১৪৩, হাদীস ১৭৯

হযরত উমর রা. বৃদ্ধ ইহুদির জন্যে রাষ্ট্রীয় সম্পদ থেকে ভাতার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন- এটা তো তিনি শাসক হিসেবে করতেই পারেন। কিন্তু তিনি সেই ইহুদিকে লক্ষ করে যে কথাটি বললেন, তা আমাদের সামনে চিন্তার নতুন দুয়ার খুলে দিতে পারে। যে সহানুভূতি তিনি প্রকাশ করেছেন এটাই ইসলামের সৌন্দর্য ও আসল চরিত্র।

অমুসলিমদের সাথে সুন্দর ও সৌজন্যপূর্ণ আচরণ রক্ষার শিক্ষাপ্রদানের পাশাপাশি ইসলাম তাকিদের সাথে বারবার এ নির্দেশও দিয়েছে- 'কোনো মুসলমান যেন কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করে।' এবং এ তাকিদও করেছে, সৌজন্য ও উদারতার নামে যেন নিজেদের দ্বীনদারি আক্রান্ত না হয়। দ্বীনের বিষয়ে আপোস করা কোনোক্রমেই বৈধ নয়। এমনিভাবে সদাচরণের ক্ষেত্রে কোনো অমুসলিমকে মুসলিম ভাই থেকে প্রাধান্য দেওয়াও বৈধ নয়।

সুন্দর আচরণও অনেক সময় দাওয়াতের ভূমিকা পালন করে। হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এমন মহানুভব আচরণে মুগ্ধ হয়েও তো অনেকে ইসলাম কবুল করেছেন এবং

পরবর্তীতেও সাহাবাদের যুগ থেকে শুরু করে যারা ইসলামের সুন্দর আচারগুলো নিজেদের মাঝে লালন করে গেছেন, তাদের আচরণ নীরবে অমুসলিমদের ইসলামের দিকে আহ্বান জানাতো। অমুসলিমরা এতে যথেষ্ট প্রভাবিত হতো। আশ্রয় নিতো ইসলামের শীতল ছায়ায়। আমাদের জীবনকে যদি আমরা এ ছাঁচে ঢেলে সাজাতে পারি, তাহলে অমুসলিমদের মন জয় করে ইসলাম ও মুসলমানের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা হয়তো তেমন কঠিন হবে না।

★অমুসলিমদের সাথে আচরণে কুরআনের নির্দেশনা

মুসলিমপ্রধান বেশিরভাগ দেশের মতো আমাদের দেশেও ইসলাম ধর্মের অনুসারী ছাড়া অন্যান্য ধর্মের বহু মানুষ আছে, যাদের সাথে বিভিন্ন প্রয়োজনে আমাদের ওঠাবসা, লেনদেন ইত্যাদি করতে হয়। আমাদের সহকর্মী ও প্রতিবেশীদের অনেকে অমুসলিম। এছাড়া অমুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করা কেউ মুসলমান হলে তার আত্মীয়দের বেশিরভাগই অমুসলিম হওয়া স্বাভাবিক।

ইসলাম মুসলমানদের মতোই অমুসলিম আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, সহকর্মীদের সাথে ন্যায় ও উত্তম আচরণ করার নির্দেশ দেয়। আত্মীয় ও প্রতিবেশী হিসেবে তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করার নির্দেশ দেয়। তবে তাদের প্রভাবে বা মন রক্ষার জন্য আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত কাজ করতে নিষেধ করে। কোরআনে আল্লাহ অমুসলিম বাবা-মায়ের শিরক করার নির্দেশ পালন করতে নিষেধ করার পাশাপাশি দুনিয়াবি অন্যান্য ব্যাপারে তাদের সাথে উত্তম আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

وَ وَصَّیۡنَا الۡاِنۡسَانَ بِوَالِدَیۡهِ حَمَلَتۡهُ اُمُّهٗ وَهۡنًا عَلٰی وَهۡنٍ وَّ فِصٰلُهٗ فِیۡ عَامَیۡنِ اَنِ اشۡکُرۡ لِیۡ وَ لِوَالِدَیۡکَ اِلَیَّ الۡمَصِیۡرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون.َ

আর আমি মানুষকে তার বাবা-মায়ের সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তাকে গর্ভে ধারণ করে, তার দুধ ছাড়ানো হয় দুবছরে; সুতরাং আমার ও তোমার বাবা-মায়ের শুকরিয়া আদায় করো। প্রত্যাবর্তন তো আমার কাছেই। তোমার বাবা-মা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সাথে শরীক করতে যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তাহলে তুমি তাদের কথা মানবেনা। তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে আর অনুসরণ করো তার পথ, যে আমার অভিমুখী হয়। তারপর তোমরা ফিরে আসবে আমার কাছে এবং তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদের অবহিত করবো। (সুরা লোকমান: ১৫)

কোরআনের আরেক জায়গায় আল্লাহ অমুসলিমদের দুটি দলে ভাগ করেছেন; একদল যারা জালিম, মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত, আরেকদল যারা মুসলমানদের ওপর জুলুম করেনি বা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত নয়। মুসলমানদের ওপর জুলুম করেনি বা যুদ্ধরত নয় এমন অমুসলিমদের সাথে ন্যায় ও উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন,

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের সঙ্গে সদাচরণ করতে ও তাদের প্রতি ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন। আল্লাহ তো তোমাদের তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছেন, যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে এবং তোমাদেরকে বের করার কাজে একে অন্যের সহযোগিতা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে তারা জালিম। (সুরা মুমতাহিনা: ৮, ৯)

আল্লাহ তাআলা মুমিন মুসলমানের প্রতি আয়াত নাজিল করে এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, ‘মুমিনগণ যেন মুমিনদের পরিবর্তে কাফের বা অবিশ্বাসীদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে।’ কুরআনের একাধিক স্থানে এ নির্দেশনা এসেছে।কুরআনের এসব নির্দেশনার অর্থ এ নয় যে, অবিশ্বাসী কিংবা অমুসলিমদের সঙ্গে সদাচরণ বা ভালো ব্যবহার করা যাবে না। বরং কুরআন ও হাদিসের একাধিক স্থানে অবিশ্বাসী বা অমুসলিমদের সঙ্গে সদাচরণের গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বদরের যুদ্ধে বন্দি হওয়া অমুসলিম অবিশ্বাসীরাই এর জলন্ত প্রমাণ।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদর যুদ্ধের বন্দিদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম বিশ্বনবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ মোতাবেক বিশ্বমানবতার জন্য এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

যুদ্ধকালীন সময়ে সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের খাদ্য বন্দিদের খেতে দিয়েছিলেন। এমনকি নিজেরা না খেয়ে ক্ষুধা নিয়ে রাত অতিবাহিত করেছিলেন। নিজেরা না খেয়ে ক্ষুধার্থ অবস্থায় অবিশ্বাসী শত্রুদের খাবার দেয়ার এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।বদর যুদ্ধের সময় বন্দিদের সঙ্গে করা উত্তম আচরণেই প্রমাণিত হয় যে, অমুসলিম বা অবিশ্বাসীদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহারের তাগিদ দেয় ইসলাম। তবে ইসলাম যে বিষয়টিকে অবৈধ ঘোষণা করেছে তাহলো-‘অবিশ্বাসী বা অমুসলিমদের সঙ্গে ওই আন্তরিক প্রীতি ও ভালোবাসা রাখা যাবে না। যে আন্তরিক প্রীতি ও ভালোবাসা মুসলমানদের সঙ্গে রাখার নির্দেশনা দিয়েছে ইসলাম।’

★অমুসলিমদের অধিকার সংরক্ষণে ইসলাম

ধর্মে-বর্ণে বৈচিত্র্য থাকলেও সৃষ্টিগতভাবে সব মানুষই এক। সবাইকে মহান আল্লাহ আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) থেকে সৃষ্টি করেছেন। সর্বোপরি তিনি মানুষকে সম্মানিত করেছেন এবং সব সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করেছেন। ইসলাম আল্লাহর মনোনীত ধর্ম।

তথাপি সমাজে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বসবাস করে। এ ক্ষেত্রে ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য ইসলাম বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছে। সেগুলো যথার্থভাবে বাস্তবায়িত হলে পারস্পরিক সুসম্পর্ক, সামাজিক শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

১.প্রাণ-সম্পদের নিরাপত্তা প্রদান : যেসব অমুসলিম মুসলিম দেশে রাষ্ট্রের আইন মেনে বসবাস করে অথবা ভিসা নিয়ে মুসলিম দেশে আসে, তাদের সুরক্ষা এবং জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করল, সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না, অথচ তার সুগন্ধ ৪০ বছরের রাস্তার দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।' (বুখারি, হাদিস : ২৯৯৫)

২.ধর্মীয় অধিকার : প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। মুসলিম সমাজেও অমুসলিমরা নিজেদের পরিমণ্ডলে ধর্মীয় উৎসব উদযাপন করবে। অমুসলিমদের যেসব রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠান ধর্ম পালনের অংশ, সেগুলোতে মুসলিমদের অংশগ্রহণ করার সুযোগ নেই।

আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের দ্বিন তোমাদের, আমার দ্বিন আমার।' (সুরা : কাফিরুন, আয়াত : ৬)

৩.দেশ রক্ষা ও জাতীয় নিরাপত্তায় সবার অংশগ্রহণ : রাসুলুল্লাহ (সা.) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার পর মদিনায় বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্মের অনেক পণ্ডিত স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। হিজরতের পাঁচ মাস পর মদিনা রাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা ও পারস্পরিক সহাবস্থান নিশ্চিত করতে রাসুলুল্লাহ (সা.) মদিনায় বসবাসকারী অমুসলিমদের সঙ্গে লিখিত চুক্তি সম্পাদন করেন, যা মদিনা সনদ নামে পরিচিত।

সনদে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নেতৃত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি প্রাধান্য পায়। যত দিন তারা এ চুক্তি রক্ষা করেছে তত দিন তাদের সঙ্গে মুসলমানদের ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ বহাল ছিল।

৪.বল প্রয়োগ করে ইসলাম নয় : ইসলামের সৌন্দর্যে অনুপ্রাণিত হয়ে যুগে যুগে মানুষ স্বেচ্ছায় ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে। কোনো ধরনের চাপ বা বল প্রয়োগ করে ইসলামে দীক্ষিত করার কোনো বিধান নেই। আল্লাহ বলেন, 'দ্বিন সম্পর্কে জোর-জবরদস্তি নেই; সত্য পথ ভ্রান্ত পথ থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে। যে তাগুতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে সে এমন এক মজবুত হাতল ধরবে, যা কখনো ভাঙবে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ২৫৬)

৫.আর্থিক ও অন্যান্য লেনদেন : আর্থিক লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সেবার আদান-প্রদান সব ধর্মের মানুষের সঙ্গে পরিচালনা করতে কোনো বাধা নেই। রাসুলুল্লাহ (সা.) অনেকবার ইহুদিদের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছেন এবং যথাসময়ে তা পরিশোধ করে দিয়েছেন। একবার একজন ঋণদাতা ইহুদি নির্ধারিত সময়ের আগেই এসে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে খারাপ আচরণ করে। রাসুলুল্লাহ (সা.) এর কোনো প্রতিবাদ না করে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করতে সাহাবাদের নির্দেশ দেন।

৬.মানবিক আচরণ : সব মানুষের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ ও মানবীয় আচরণ প্রদর্শন ইসলামের অন্যতম শিক্ষা। কারণ মানুষ হিসেবে সবাই সমান। আল্লাহ সব মানুষকে সম্মানিত করেছেন। হাদিসে এসেছে, একদিন সাহল ইবনে হুনাইফ (রা.) ও কায়েস ইবনে সাদ (রা.) কাদেসিয়াতে বসা ছিলেন। তখন তাঁদের পাশ দিয়ে একটি লাশ নিয়ে কিছু লোক অতিক্রম করল। তাঁরা দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তাঁদের বলা হলো, লাশটি অমুসলিমের। তাঁরা বলেন, মহানবী (সা.)-এর পাশ দিয়ে একসময় একটি লাশ নেওয়া হয়েছিল। তখন তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁকে বলা হলো, এটা তো এক ইহুদির লাশ। তখন তিনি বলেন, 'তা কি প্রাণ নয়?' (বুখারি, হাদিস : ১২৫০)

৭.পারস্পরিক সহযোগিতা : পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ও অন্যের প্রয়োজনে এগিয়ে আসা ইসলামী সমাজব্যবস্থার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। এটি মুসলিম-অমুসলিম

সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আল্লাহ বলেন, ‘দ্বিনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেনি তাদের সঙ্গে মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।’ (সুরা : মুমতাহিনা, আয়াত : ৮)

৮.অসুস্থ হলে শুশ্রূষা করা : অমুসলিম রোগীকে দেখতে যাওয়াও সুন্নত। নবী (সা.) অমুসলিম রোগীদের দেখতে যেতেন এবং তাদের ঈমানের দাওয়াত দিতেন। তাদের সেবা করতেন। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ইহুদি নবী (সা.)-এর খেদমত করত। সে অসুস্থ হলে নবী (সা.) তাকে দেখতে গেলেন। তার মাথার দিকে বসে নবীজি বলেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। তখন সে তার পিতার দিকে তাকাল। পিতা বলেন, তুমি আবুল কাসেমের (নবীর) অনুসরণ করো। ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করল। তখন নবী (সা.) এই বলে বের হলেন, ‘আল্লাহর শুকরিয়া, যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন।’ (বুখারি, হাদিস : ১২৯০)

৯.প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষা করা : সব ধর্মের মানুষ প্রতিবেশী হতে পারে। প্রতিবেশী যে ধর্মেরই হোক প্রতিবেশী হিসেবে তাদের প্রতি সদয় আচরণ, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা প্রদর্শনে কোনো প্রকার ত্রুটি করা যাবে না। প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষায় ইসলাম অত্যন্ত তৎপর। ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘জিবরাঈল (আ.) আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে অবিরত উপদেশ দিচ্ছিলেন, এমনকি আমি ধারণা করলাম যে, আল্লাহ তাদের ওয়ারিশ বানিয়ে দেবেন।’ (বুখারি, হাদিস : ৫৬৬৮; মুসলিম, হাদিস : ৬৮৫৪)

১০.আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা : আত্মীয় অমুসলিম হলেও সম্পর্ক রক্ষা করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, ‘তোমার মাতা-পিতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তুমি তাদের কথা মানবে না, তবে পৃথিবীতে তাদের সঙ্গে বসবাস করবে সদ্ভাবে।’ (সুরা : লোকমান, আয়াত : ১৫)

আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) বলেন, রাসুলের যুগে আমার মা আমার কাছে এলেন মুশরিক অবস্থায়। তখন আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার মা এসেছেন, তিনি অমুসলিম। আমি কি তাঁর আত্মীয়তা রক্ষা করব? নবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা রক্ষা করো। (বুখারি, হাদিস : ২৪৭৭)

১১.যুদ্ধাবস্থায়ও অমুসলিমদের উপাসনালয়ে হামলা করা নিষিদ্ধ: ইসলামের বিধান হলো, ভিন্ন ধর্মের উপসনালয়ে সাধারণ অবস্থায় তো বটেই, যুদ্ধাবস্থায়ও হামলা করা যাবে না। কোনো ধর্মীয় পুরোহিতের প্রতি অস্ত্র তাক করা যাবে না। কোনো উপসনালয় জ্বালিয়ে দেওয়া যাবে না। রাসূলুল্লাহ (সা.) কোনো জনপদে সৈন্যদল প্রেরণকালে বলতেন,

আমি তোমাদের (কয়েকটি উপদেশ দিয়ে) প্রেরণ করছি: (যুদ্ধক্ষেত্রে) তোমরা বাড়াবাড়ি করবে না, ভীরুতা দেখাবে না, কারো চেহারা বিকৃত করবে না, কোনো শিশুকে হত্যা করবে না, কোনো গির্জা জ্বালিয়ে দেবে না এবং কোনো গাছ উৎপাটন করবে না। (মুসান্নাফ আবদির রাযযাক,হাদীস -৯৪৩০)

যে ধর্ম যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের সঙ্গে এরূপ আচরণের নির্দেশ দেয়, সেই ধর্ম সাধারণ অবস্থায় এবং স্বাভাবিক পরিবেশে অমুসলিমের সঙ্গে কী ধরনের আচরণের আদেশ করে, তা সহজেই অনুমেয়। এজন্য আমরা দেখতে পাই, মুসলমানদের সোনালি যুগে কোনো দেশে মুসলিম সৈন্য প্রবেশ করলে সাধারণ মানুষ স্বপ্রণোদিত হয়ে ইসলামধর্ম গ্রহণ করত। যুদ্ধ হতো শুধু সৈন্যদের সঙ্গে, বেসামরিক নাগরিকদের কিছুই বলা হতো না। তবু তারা ইসলাম গ্রহণ করত। কারণ তারা এর আগে দেখেছে, যুদ্ধ শুধু ধ্বংসযজ্ঞ বয়ে আনে। কোনো জনপদে বিদেশি সৈন্য এলে তারা সেখানকার পরিবেশ ধ্বংস করে দিত। একমাত্র মুসলিম সৈন্যরাই ছিলেন ব্যতিক্রম। মুসলিমদের অনুপম চরিত্র দেখে ইসলামের সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় নিত।

১২.অমুসলিমদের বাড়িতে আসা-যাওয়া করা বৈধ: ইসলাম কখনোই কোনো অমুসলিমের অধিকার হরণ করার কথা বলে না। বরং মুসলমান অমুসলিমের বাড়িতে আসা-যাওয়া করতে এবং তার থেকে বৈধ, হালাল খাবারও গ্রহণ করতে পারবে। রাসূল (সা.) নিজে অমুসলিমদের ঘরে খাবার খেয়েছেন এবং অমুসলিমকে তিনি নিজে খাইয়েছেন। হাদীসে বর্ণিত আছে,

আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, এক ইহুদি মহিলা নবী (সা.)-এর কাছে বিষ মিশ্রিত বকরী নিয়ে এলো। সেখান থেকে কিছু অংশ তিনি খেয়েছেন।(সহীহ বুখারী,হাদীস-২৪৭৪)

১৩.অমুসলিমদের সঙ্গে সামাজিক কাজকর্ম করা যাবে: অনেক সাহাবা কিরাম অমুসলিমের অধীনে কাজ করেছেন এবং অমুসলিমকে দিয়ে নিজেদের কাজ করিয়েছেন। আলী (রা.) কূপ থেকে প্রতি বালতি পানি উত্তোলনের বিনিময়ে একটি করে খেজুর দেবে, এই শর্ত ইহুদির কাজ করেছেন।(সুনান তিরমিযী,হাদীস-২৪৭৩)

রাসূল (সা.) এক ইহুদির কাছে বর্ম বন্ধক দিয়ে কিছু ঋণ এনেছিলেন।(সহীহ বুখারী,হাদীস-২৩৮৬)

আম্মাজান আয়েশা, আলী, ও উমর (রা.) প্রমুখ অমুসলিম প্রতিবেশীর বাসায় খাবার আদান-প্রদান করতেন।(সুনান আবু দাউদ,হাদীস-৫১৫২)

বোঝা গেল, বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে অমুসলিমদের সঙ্গে সামাজিক কাজকর্ম করা যাবে।

পরিশেষে বলা যায়, মুসলিম সমাজে উল্লিখিত দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত ও বাস্তবায়িত হলে ইসলামের সৌন্দর্য সবাইকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করবে নিঃসন্দেহে।

★ অমুসলিমদের সাথে কথোপকথনের মাধুর্য

রাসুল (সাঃ) আমাদেরকে মুসলিমদের সাথে আচরণের আদর্শিক পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন।তিনি শিখিয়েছেন,অমুসলিমদেরকে শুধুমাত্র স্বীকার করাই যথেষ্ট নয়, বরং তাদেরকে যথোপযুক্ত সম্মানও দিতে হবে।এটা তার ব্যক্তিগত চিন্তা নয়,বরং এ শিক্ষা পবিত্র কুরআনেরই প্রতিধ্বনি।

পবিত্র কুরআনে অমুসলিমদের সাথে কথোপকথনের পদ্ধতি শিক্ষা দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ وَ اِنَّاۤ اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۲۴﴾ قُلْ لَّا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّاۤ اَجْرَمْنَا وَ لَا نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۲۵﴾ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ؕ وَ هُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ ﴿۲۶﴾

"বল, আসমানসমূহ ও জমিন থেকে কে তোমাদের রিজিক দেন? বল, 'আল্লাহ', আর নিশ্চয়ই আমরা অথবা তোমরা সৎপথে প্রতিষ্ঠিত অথবা স্পষ্ট তো বিভ্রান্তিতে পতিত। বল,আমরা যে অপরাধ করছি সে ব্যাপারে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না আর তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আমাদেরকেও জিজ্ঞাসা করা হবে না। বল,আমাদের রব আমাদেরকে একত্র করবেন। তারপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফয়সালা করবেন। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী ও সম্যক পরিজ্ঞাত।"

[সুরা সাবা-(আয়াত ২৪-২৬)]

রাসুল (সাঃ) জানতেন তিনি হেদায়েত এবং সত্যের উপর প্রতিষ্টিত রয়েছেন। তবুও আল্লাহ তা'আলা তাকে অমুসলিমদের সাথে এভাবে কথা বলতে আদেশ করেছেন যে, "নিশ্চয়ই আমরা অথবা তোমরা সৎ পথে প্রতিষ্ঠিত তোমার স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত " (সুরা সাবা-২৪)

এটি ইসলামের উন্নত চরিত্র, চূড়ান্ত সভ্যতা ও কথোপকথনের আদর্শিক পন্থা। আল্লাহ তা'আলা অমুসলিমদেরকে পূর্ণ ভদ্রতা বজায় রেখে সম্বোধন করার আদেশ দিয়ে বলেন-

قُلْ لَّا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّآ اَجْرَمْنَا وَ لَا نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٥﴾

"আমরা যে অপরাধ করছি সে ব্যাপারে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আমাদেরকেও জিজ্ঞাসা করা হবে না।" [সূরা সাবা, আয়াত: ২৫]

এই আয়াতে جرم তথা 'অপরাধ' শব্দটি ব্যবহার করি মুসলিমদের বেলায় বলা হয়েছে, আমরা যদি কোন অপরাধ করি সে বিষয়ে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না। আর عمل তথা 'কাজ' শব্দটি ব্যবহার করে অমুসলিমদের বেলায় বলা হয়েছে, তোমরা যে কাজ করছ সেজন্য আমরা জিজ্ঞাসিত হবো না।হিসাব-নিকাশের পূর্ণ দায়িত্ব আল্লাহর দিকে সমর্পিত করে দিয়ে বলা হয়েছে এভাবে যে, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে আমাদেরকে একত্রিত করবেন এবং সত্যের পক্ষে ফয়সালা দিয়ে দিবেন, তখন আমরা জানতে পারবো কে সঠিক পথে ছিল আর কে ভুল করছিল।"

এটিই হল পারস্পরিক কথোপকথনের সর্বোৎকৃষ্ট হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতি যেখানে পক্ষপাত মূলক চিন্তা কিংবা কঠোরতা বা রূঢ়তার লেশ মাত্রও নেই। যেখানে রয়েছে প্রতিপক্ষের প্রতি পূর্ণ ভদ্রতা প্রকাশ এবং যথাযথ মূল্যায়নের বাস্তব প্রতিফল।
এমনই ভাবে আহলে কিতাবদের সাথে কথোপকথনের পদ্ধতি নির্ধারণপূর্বক আল্লাহ তা'আলা বলেন -

وَ لَا تُجَادِلُوْۤا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ ۖ اِلَّا الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَ قُوْلُوْۤا اٰمَنَّا بِالَّذِیْۤ اُنْزِلَ اِلَیْنَا وَ اُنْزِلَ اِلَیْكُمْ وَ اِلٰـهُنَا وَ اِلٰـهُكُمْ وَاحِدٌ وَّ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿٤٦﴾

“আর তোমরা উত্তম পন্থা ছাড়া কিতাবীদের সাথে বিতর্ক করবে না, তবে তাদের সাথে করতে পার, যারা তাদের মধ্যে যুলুম করেছে।আর তোমরা বল, আমাদের প্রতি এবং তোমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে, তাতে আমরা ঈমান এনেছি। আর আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ তো একই। আর আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমার্পণকারী।(সুরা আল-আনকাবুত:৪৬)

আহলে কিতাবদের সাথে এই অতি উত্তম, অতি সুন্দর ও অতি উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে কথা বলার আদেশ দেওয়া হয়েছে।
এ ধরনের অন্তর গলানো এবং মন নরম করা সম্বোধনে আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের মনে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি মনোভাব জাগিয়ে তুলে পারস্পারিক হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে।

তারা তখন এভাবে চিন্তা করার অবকাশ পায় যে, তাদের উভয়ের ইলাহ এক ও অদ্বিতীয়।আমাদের উপরেও কিতাব নাযিল হয়েছে এবং তাদের উপরেও কিতাব নাযিল হয়েছে। যারা উভয় কিতাবকে বিশ্বাসও করে। তাহলে আর অনৈক্য বা বিরোধ কীসের?

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা আরোও বলেন-

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَ لَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿۶۴﴾

“আপনি বলুন, হে আহলে কিতাবগণ! এস সে কথায়, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত না করি, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করি এবং আমাদের কেউ আল্লাহ ছাড়া একে অন্যকে রব হিসেবে গ্রহণ না করি। তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তোমরা বল, তোমরা সাক্ষী থাক যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম।(সুরা আলে ইমরান-৬৪)

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন-

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚۖ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوْا وَ اصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠٩﴾

“কিতাবীদের অনেকেই চায়, যদি তারা তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনার পর কাফেররূপে ফিরিয়ে নিতে পারত! সত্য স্পষ্ট হওয়ার পরও তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে বিদ্বেষবশতঃ (তারা এটা করে থাকে)। অতএব, তোমরা ক্ষমা কর এবং উপেক্ষা কর যতক্ষণ না আল্লাহ তার কোন নির্দেশ দেন,নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।”

রাসুল (সাঃ) অমুসলিমদের সাথে কথা বলার সময় প্রতিপক্ষের কথা যত অশ্লীল,মিথ্যা,অবাস্তব বা কষ্টদায়কই হোক না কেন তা তিনি ধৈর্য সহকারে শুনতেন এবং প্রতিপক্ষ কথা বলার সময় তিনি পূর্ণ নিরব থাকতেন।নিম্নে কুরাইশ নেতা উতবাহ ইবনে রবী'আহ এবং রাসুল (সাঃ) এর কথোপকথন তুলে ধরা হলো -

উতবাহ রাসুল (সাঃ) কে ইসলাম থেকে সরে আসার জন্য অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে বুঝাচ্ছিল, সে বলছে:হে ভাতিজা,আমাদের মাঝে এবং আমাদের সম্প্রদায়ের মাঝে তোমার মর্যাদা ও সম্মানের কথা তো তোমার জানা আছে। কিন্তু নিশ্চই তুমি অনেক বড় বিষয় নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছো। তুমি আমাদের সম্প্রদায়ের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করছো। তোমার অনুসারীদেরকে তুমি জান্নাত-জাহান্নামের মিথ্যা স্বপ্ন দেখাচ্ছ। তুমি আমাদের দেব-দেবি ও ধর্মের নিন্দাবাদ করে বেড়াচ্ছ। আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে গাল-মন্দ করছ। আমি তোমার নিকট কয়েকটি বিষয় পেশ করছি, তুমি মনোযোগসহ শুন যাতে তন্মধ্য কোনো একটাকে বেছে নিতে পার। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বললেন, বলুন, হে আবুল ওয়ালীদ! আমি শুনছি ওতবা বলল: ভাতিজা! তুমি এটা বলো যে, শেষ পর্যান্ত তুমি চাও কী? তুমি কি মক্কার সবচেয়ে বড় ধনী হতে চাও? তাহলে আমরা বহু ধন-সম্পদ এনে তোমার সামনে স্তুপ করে দেব। নাকি তুমি সম্মান চাও? তাহলে আমরা সবাই মিলে তোমাকে এমনভাবে সম্মান প্রদর্শন করবো যে, তোমাকে ছাড়া আমাদের কোনো সিদ্ধান্তই বাস্তবায়িত হবে না। নাকি তুমি মক্কার রাজত্ব চাও? তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের রাজা বানিয়ে দেব। নাকি এসব কিছু তুমি স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে করছ না বরং তোমার নিকট যে অদৃশ্য আগন্তুক আসে সে জিন্ন এবং তার হাত থেকে আত্মরক্ষায় তুমি যদি অক্ষম হয়ে থাক তাহলে বলো, আমরা আমাদের টাকা-পয়সা ব্যয় করে চিকিৎসা করে তোমাকে সুস্থ করে তুলব। কেননা, অনেক সময় অনুসঙ্গী তার মূল ব্যক্তির ওপর প্রাধান্য লাভ করে, ফলে চিকিৎসার প্রয়োজন দেখা দেয়।

এতক্ষণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উতবার কথা মন দিয়ে শুনছিলেন। তার কথা শেষ হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবুল ওয়ালীদ! আপনার বক্তব্য কি শেষ হয়েছে? সে বলল: হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,এবার আমার কথা শুনুন। সে বললো, শুনছি।অতঃপর রাসুল (সাঃ) পড়তে শুরু করলেন-

حٰمٓ ۚ﴿۱﴾ تَنۡزِیۡلٌ مِّنَ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۚ﴿۲﴾ کِتٰبٌ فُصِّلَتۡ اٰیٰتُهٗ قُرۡاٰنًا عَرَبِیًّا لِّقَوۡمٍ یَّعۡلَمُوۡنَ ۙ﴿۳﴾
بَشِیۡرًا وَّ نَذِیۡرًا ۚ فَاَعۡرَضَ اَکۡثَرُهُمۡ فَهُمۡ لَا یَسۡمَعُوۡنَ ﴿۴﴾ وَ قَالُوۡا قُلُوۡبُنَا فِیۡۤ اَکِنَّۃٍ مِّمَّا تَدۡعُوۡنَاۤ
اِلَیۡهِ وَ فِیۡۤ اٰذَانِنَا وَقۡرٌ وَّ مِنۡۢ بَیۡنِنَا وَ بَیۡنِکَ حِجَابٌ فَاعۡمَلۡ اِنَّنَا عٰمِلُوۡنَ ۚ﴿۵﴾

“ হা-মীম।এটা রহমান, রহীমের কাছ থেকে নাযিলকৃত।এক কিতাব, বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে এর আয়াতসমূহ, কুরআনরূপে আরবী ভাষায়, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য।সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। অতঃপর তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। অতএব, তারা শুনবে না।আর তারা বলে, তুমি যার প্রতি আমাদেরকে ডাকছ সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণ-আচ্ছাদিত, আমাদের কানে আছে বধিরতা এবং তোমার ও

আমাদের মধ্যে আছে পর্দা; কাজেই তুমি তোমার কাজ কর, নিশ্চয় আমরা আমাদের কাজ করব।"
(সুরা ফুসসিলাত:১-৫)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়েই যাচ্ছেন। উতবা শুনতে শুনতে একেবারে নিরব-নিস্তব্ধ হয়ে গেল এবং উভয় হাত পেছনে দিয়ে টেক লাগিয়ে শুনতেছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাজদাহর আয়াত পর্যন্ত পড়লেন এবং সাজদাহ আদায় করলেন। অতঃপর উতবাকে লক্ষ্য করে বললেন,

"হে আবু ওয়ালীদ,তুমি যা শোনার শুনেছো?এটাই আমার পক্ষ থেকে তোমার বক্তব্যের উত্তর।"

এরপর উতবাহ তার গোত্রের নিকট ফিরে গেল। গোত্রের লোকেরা বলাবলি করতে লাগল যে, আল্লাহর শপথ! উতবাহ যে চেহারা নিয়ে গিয়েছে তার ভিন্ন চেহারা নিয়ে ফিরেছে। উতবাহ যখন তাদের নিকট গিয়ে বসলো তখন তারা তাকে জিজ্ঞাসা করল, কী খবর হে আবুল ওয়ালীদ? সে বলল, আজ আমি যা শুনেছি জীবনে কোনো দিন তা শুনি নি। আল্লাহর শপথ! এটা কোনো কবিতা নয় এবং কোনো যাদুকর কিংবা গণকের কথাও নয়। হে কোরাইশ সম্প্রদায়! তোমরা আমার কথা মেনে তার অনুসরণ কর এবং আমাকে তার অনুসরণ করতে দাও। আমার মতে, তোমরা তাকে তার অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও। আল্লাহর শপথ! যা আমি শুনেছি তা অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ হতে প্রাপ্ত অহী বৈ অন্য কিছু নয়। সে যদি তার উদ্দেশ্যে অকৃতকার্য হয় তাহলে সে নিজে নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি সে সফল হয়ে যায় তাহলে তাতে তোমাদেরই সম্মান। তার রাজত্ব তোমাদেরই রাজত্ব। তার কারণে তোমরা হয়ে যাবে অন্য সকল জাতির চেয়ে সৌভাগ্যবান। উতবাহর এ কথাগুলো শুনে তারা বলতে লাগল, হে আবুল

ওয়ালীদ! মুহাম্মাদ তার ভাষা দ্বারা তোমাকেও যাদু করে ফেলেছে। উতবাহ বলল, এটা আমার মতামত, তোমরা যা ইচ্ছা তাই করতে পার।

এ কথোপকথনের মাঝে লক্ষ্য করার মতো অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। উতবাহ তার কথা শুরুই করেছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অনেকগুলো মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগ উত্থাপনের মাধ্যমে। তথাপিও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষনাত কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করে অত্যন্ত ধৈর্য্য ও মনোযোগ সহকারে শুনতে লাগলেন এবং উতবাহ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইসলামের দাওয়াত থেকে বিরত রাখার জন্য প্ররোচনা দিতে শুরু করলেও তিনি পূর্ণ নিরবতা পালন করলেন এবং বেশ শান্তস্বরে বললেন, 'বলুন, হে আবুল ওয়ালীদ! আমি শুনছি' এবং তিনি তাকে উতবাহ নামে সম্বোধন না করে তার সবচেয়ে প্রিয় তার উপনাম তথা 'আবুল ওয়ালীদ' দ্বারা সম্বোধন করলেন। আবার দেখুন, উতবাহ যখন অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে সম্পদ, সম্মান, রাজত্ব ইত্যাদি পার্থিব লোভ-লালসার বিষয়গুলো উপস্থাপন করতে লাগল তখনও তিনি রাগান্বিত হন নি বরং শেষ পর্যন্ত শুনে গেলেন এবং চূড়ান্ত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বললেন, হে আবুল ওয়ালীদ! আপনার বক্তব্য কি শেষ হয়েছে? সে বলল: হ্যাঁ। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এবার আমার কথা শুনুন।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে স্বাধীনভাবে তার বক্তব্য উপস্থাপনের এবং নিজ মতামত পেশ করার পূর্ণ সুযোগ দিলেন। তার বক্তব্যের সমাপ্তির পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা বলা শুরু করলেন। এখানে তিনি আমাদের জন্য অন্যদের সাথে এমনকি ভিন্ন মতাবলম্বীদের সাথেও কথোপকথনের এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

[রেফারেন্স:অমুসলিমদের সাথে রাসুল (সাঃ) এর আচরণ]

★ইসলামী শরী'আতে অমুসলিমদের সাথে ন্যায়পরায়ণতা

ন্যায়পরায়ণতা ইসলামী শরী'আতের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি।এতে কোন অবহেলা বা তারতম্য করার সুযোগ নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

اِنَّ اللّٰہَ یَاۡمُرُ بِالۡعَدۡلِ وَ الۡاِحۡسَانِ وَ اِیۡتَآیِٔ ذِی الۡقُرۡبٰی وَ یَنۡہٰی عَنِ الۡفَحۡشَآءِ وَ الۡمُنۡکَرِ وَ الۡبَغۡیِ ۚ یَعِظُکُمۡ لَعَلَّکُمۡ تَذَکَّرُوۡنَ ﴿۹۰﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ্ আদল (ন্যায়পরায়ণতা), ইহসান (সদাচরণ), ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসৎকাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন; তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

(সুরা আন-নাহল:৯০)

অন্য আর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

اِنَّ اللّٰہَ یَاۡمُرُکُمۡ اَنۡ تُؤَدُّوا الۡاَمٰنٰتِ اِلٰۤی اَہۡلِہَا ۙ وَ اِذَا حَکَمۡتُمۡ بَیۡنَ النَّاسِ اَنۡ تَحۡکُمُوۡا بِالۡعَدۡلِ ؕ

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে ফিরিয়ে দিতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে" (সুরা আন-নিসা-৫৮)

ন্যায়পরায়ণতা কোনো ঐচ্ছিক বিষয় বা শুধু ফজিলতপূর্ণ আমল নয়।বরং এটি একটি অত্যাবশ্যকীয় আদেশ, ছাড়া শরী'আতের বিধান প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কোন মু'মিনের জন্য এটা যথাযথ নয় যে,সে ন্যায়পরায়ণতা ছাড়া কোন ফয়সালা সম্পাদন করবে।

আবু হুরাইরাহ রা. বর্ণনা করেন যে,

سبعة يظلهم الله تعالى
في ظلهِ يَوْمَ لا ظل إلا ظله إِمَامٌ عَدَل َ

“যেদিন আল্লাহর ('আরশের) ছায়া ব্যতীত কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন আল্লাহ তা'আলা সাত শ্রেণির মানুষকে সে ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। (তাদের মধ্যে এক প্রকার হিসেবে উল্লেখ করেছেন) ন্যায়পরায়ণ শাসক।”

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ আরেকটি হাদীস আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন,

من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين

"যে ব্যক্তি এক বিঘত জমি অন্যায়ভাবে নিয়ে নেয়, কিয়ামতের দিন এর

সাত তবক জমি তার গলায় লটকিয়ে দেওয়া হবে।"

আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

من أعان على خصومة بظلم أو يعين على ظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع

"যে ব্যক্তি কোনো অন্যায় ঝগড়া বা যুলুমের ব্যাপারে অন্যকে সহযোগিতা করে ততক্ষণ পর্যন্ত তার ওপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হতে থাকে যতক্ষণ ঐ যুলুমের অবসান না হয়।”

এ ক'টি হাদীসে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দাবলী ব্যবহৃত হয়েছে, যা মুসলিম ও অমুসলিম সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করে। কাজেই সর্বাবস্থায় যুলুম প্রত্যাখ্যাত এবং যে কোনো প্রেক্ষিতেই যুলুম নিষিদ্ধ। অতএব, ধর্মীয় বিশ্বাস, জাতি, বংশ, এলাকা বা গোত্রীয় সম্পর্কের ভিন্নতায়ও সর্বাবস্থায় যুলুম বা অন্যায় নিষিদ্ধ। ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠায় কোনো তারতম্য প্রদর্শন করা যাবে না।

এ সকল কারণেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য এ কথা বিশ্বাস করার পথ চিরতরে রূদ্ধ করে দিয়েছেন যে, অমুসলিমদের ওপর সামান্যতম হলেও যুলুমের বৈধতা রয়েছে। এ বিষয়ে তিনি অতি চমৎকার ও অনুপম কয়েকটি কথা বলেছেন, যেগুলো ভূপৃষ্টের সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব, যেন সকলেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শ সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারে। তিনি বলেন,

ألا من ظلم مُعَاهِدًا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أحد منه شيئًا بغير

طيب نقس فأنا حجِيجُهُ يَوْمَ القِيَامَة ِ

"যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের ওপর যুলুম করে অথবা তার কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন করে অথবা সাধ্যের বাইরে তার ওপর কোনো কিছু চাপিয়ে দেয় অথবা তার সম্মতি ছাড়া তার নিকট থেকে কোনো কিছু নিয়ে নেয় তাহলে কিয়ামত দিবসে আমি সে চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের পক্ষে তার প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াব। "

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ইয়াহূদীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিসমূহে 'আদল' এর নমুনা দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন, মদীনার উদ্দেশ্যে হিজরতের সময় কৃত চুক্তিপত্রে তিনি এ বিষয়টিকে স্পষ্টাকারে তুলে ধরেছেন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে,

وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه وإن النص للمظلوم

"নিশ্চয় কোনো ব্যক্তিকে তার সাথীর কারণে অপরাধী সাব্যস্থ করা হবে না এবং অবশ্যই মযলুমকে সহযোগিতা করা হবে।"

অনুরূপ ইয়াহুদীদের সাথে কৃত অনেক চুক্তি রয়েছে যাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ন্যায়পরায়ণতা ও নিরপেক্ষতার দাবীটিকে আরো আলোকময় করেছেন। তদ্রুপ খ্রিস্টানদের সাথে কৃত চুক্তিপত্রেও তিনি ন্যায়পরায়ণতার পারাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। যেমন, নাজরানের খ্রিস্টানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিনামায় তিনি বলেন:
ولا يوخذ رجل منهم بظلم آخر

"একের অন্যায়ে অন্যকে পাকড়াও করা হবে না"।

[রেফারেন্স:বই-অমুসলিমদের সাথে রাসুল সাঃ এর আচরণ]

★সম্পদ লেনদেনে অমুসলিমদের সাথে ন্যায়পরায়ণতা

অমুসলিমদের সাথে সম্পদ লেন-দেনের ক্ষেত্রে ন্যায়নিষ্ঠা প্রদর্শন এবং তাদের সাথে কোনো প্রকার যুলুম না করার বিষয়ে ইসলাম আদেশ দেয়।

অমুসলিমদের সাথে সম্পদের লেনদেনে রাসুল সাঃ এর আচরণ এক আদর্শিক পন্থার উদাহরণ।

এ বিষয়ে আব্দুর রহমান ইবন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত একটি হাদীস পেশ করা যেতে পারে। তিনি বলেন,

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثلاثين ومائة فقال النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَعَ أَحَدٍ منكم طعام فإذا مَعَ رَجُل صاع من طعام أو نحوه فعجن ثمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشرك مشعان طويل بقنم يسوقها فقال النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَيْعُ أَمْ عَطية أو قال هبة قال لا بَلْ بَيْعَ قال فاشترى منه شاة فصنعت فأمر نبي الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بسواد البطن يُشوَى وَايْمُ الله ما من الثلاثين ومائة إلا قد حر له حرة من سواد بطنها إن كان شاهدا أعطاها إياه وإن كانَ عَائِبًا حَبَاهَا لَهُ ثمَّ جَعَلَ فيها قطعتين فأكلنا أجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا وَفَضْلَ في القضعتين فحملته على البعيد«

"(কোনো এক সফরে) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমরা একশত ত্রিশজন লোক ছিলাম। সে সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাস করলেন, তোমাদের কারো সাথে কি খাবার আছে? দেখা গেল, এক ব্যাক্তির সঙ্গে এক সা' কিংবা তার কম-বেশি পরিমান খাদ্য (আটা) আছে। সে আটা গোলানো হলো। তারপর দীর্ঘদেহী এলোমেলো চুল বিশিষ্ট এক মুশরিক এক পাল বকরী হাকিয়ে নিয়ে এলো।রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাস করলেন।বিক্রি করবে? নাকি উপহার দিবে? সে বলল, না বরং বিক্রি করব। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছ থেকে একটা বকরী কিনে নিলেন। একশত ত্রিশজনের প্রত্যেককে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে বকরীর কলিজার কিছু কিছু করে দিলেন। যে উপস্থিত ছিল, তাকে হাতে দিলেন আর যে অনুপস্থিত ছিলো তার জন্য তুলে রাখলেন। তারপর দু'টি পাত্রে তিনি গোশত ভাগ করে রাখলেন। সবাই তৃপ্তির সাথে খেলেন। উভয় পাত্রে আরো কিছু উদ্বৃত্ত থেকে গেল। সেগুলো আমরা উটের পিঠে উঠিয়ে নিলাম।”

উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহৎ চরিত্রমাধুর্য্যের অনুপম দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছে। তিনি তো সেই মহানুভব নেতা, যিনি একশত ত্রিশজনের শক্তিশালী সৈন্যদলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, সকলেই তীব্রভাবে খাদ্যের প্রয়োজনিয়তা অনুভব করছেন,

এমতাবস্থায় যখন তার পাশ দিয়ে এক মুশরিক বকরী পাল নিয়ে যাচ্ছে তখনো তিনি কোনোরূপ বল প্রয়োগ ছাড়া তার থেক উপযুক্ত মূল্য দিয়ে বকরী কিনে সকলের চাহিদা পূরণ করলন। কিন্তু তিনি যথেষ্ট ক্ষমতাবান হওয়া সত্ত্বেও ঐ সময় বকরী তাদের খুব প্রয়োজন হওয়ার পরও বকরীওয়ালা একজন ভ্রান্ত বিশ্বাসী কাফির হওয়ার পরও তিনি একটি বারের জন্য এ কথা কল্পনা করলেন না যে, মূল্য পরিশোধ ব্যতিরেকে জোরপূর্বক অতীব প্রয়োজনীয় বকরী নিয়ে নিবেন। নিশ্চয় এটি সর্বোচ্চ পর্যায়ের ন্যয়পরায়ণতা।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সম্পদের লেন-দেনে ন্যায়- নীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে আরো বড় দৃষ্টান্ত হলো যা তিনি সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যাহ এর সাথে করলেন। মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইনের দিকে দৃষ্টি ফিরালেন। তখনও সাফওয়ান মুশরিক ছিল। তখন সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুনাইন যুদ্ধের জন্য কিছু যুদ্ধাস্ত্র প্রয়োজন হলো। আর সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যাহ ছিল মক্কারই একজন বড় অস্ত্র ব্যবসায়ী। সে সময় সাফওয়ান বৃহৎ সংখ্যক সমরাস্ত্রের মালিক ছিল। সেই সাথে সে ছিল তখন খুব বিপর্যস্থ ও বশীভূত এবং মক্কায় তার কোনো কাফির সাথীও বিদ্যমান ছিল না। মুসলিমদের সাথে তার অতীত ইতিহাসও ছিল খুব কালিমাযুক্ত। তথাপিও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছ থেকে যুদ্ধাস্ত্রসমূহ ভাড়ায় নিতে চাইলেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বিজয়ী ও ক্ষমতাসীন হওয়ার পরও তার কাছ থেকে ভাড়ায় যুদ্ধাস্ত্র নিতে চাওয়াতে সে হতভম্ব হয়ে গেল এবং বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য সে প্রশ্ন করল: হে মুহাম্মাদ এটি কি আত্মসাৎ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

لا ، بل عارية مضمونة

“না, বরং যামিনের ভিত্তিতে ভাড়া”

তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছ থেকে অর্থের বিনিময়ে ভাড়ায় যুদ্ধাস্ত্র গ্রহণ করলেন এবং তিনি নিজে এ কথায় যামিন হলেন যে, যদি কোনো অস্ত্র হারিয়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তিনি তার ক্ষতিপূরণ দিবেন।

অর্থাৎ মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে ইসলাম কারো প্রতিই জুলুমের কোন অবকাশ রাখেনা।

★বিচার ব্যবস্থায় অমুসলিমদের সাথে ন্যায়পরায়ণত

ইসলামে মুসলিম ও অমুসলিমের মাঝে বিচার ব্যবস্থায় ন্যায় ও নিষ্ঠার অনেক উদাহরণ দেখা যায়।
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাচারে এ ধরনের ঘটনার দৃষ্টান্ত অনেক। তন্মধ্যে একটি হলো,

আনসার গোত্র বনী উবাইরাক ইবন যুফার ইবন হারিস-এর এক মুসলিম ব্যক্তি কতাদাহ ইবন নু'মান নামীয় এক প্রতিবেশীর একটি বর্ম চুরি করল। তার নাম ছিল ত্ব'মা ইবন উবাইরাক, অন্য এক বর্ণনা মতে তার নাম হলো বাশীর ইবন উবাইরাক। আর এ বর্মটি আটা ভরতি একটি খাপে ঢুকানো ছিল। কাজেই চুরি করে নিয়ে যাওয়ার সময় খাপের ছিদ্র দিয়ে আটা ছড়াতে ছড়াতে নিজ ঘর পর্যন্ত গেল। তার পর সেটি যায়িদ ইবন সামীন নামীয় এক ইয়াহূদীর কাছে লুকিয়ে রাখল। অতপর ত্ব'মা ইবন উবাইরাকের কাছে বর্মের অনুসন্ধান চাইলে সে বর্ম নেয় নি মর্মে আল্লাহর নামে শপথ করল। তখন বর্মের মালিক বলল, আমি তার ঘরে আটার চিহ্ন দেখেছি। তারপরও যেহেতু সে শপথ করেছে তাই তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো এবং সকলে মিলে আটার চিহ্ন অনুসরণ করে করে ঐ ইয়াহূদীর ঘর পর্যন্ত পৌঁছল এবং সেখানে বর্মটি পেয়ে গেল। তখন চাপের মুখে ইয়াহূদী স্বীকার করল যে, ত্ব'মা ইবন উবাইরাক আমাকে

এটি দিয়েছে। ত্ব'মা ইবন উবাইরাকের এলাকাবাসী বনু যুফারের লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাদের সাথীর স্বপক্ষে অবস্থান নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ইয়াহূদীর ঘরে বর্ম পাওয়া গেছে তাকে শাস্তি দেওয়ার মনস্থ করলেন। তখন সূরা নিসার নিম্নোক্ত আয়াতগুলো নাযিল হয়:

إنا أنزلنا إليك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما أرنك الله ولا تكن

الخائنين خصيمًا ١٠٥ وأستغفر الله إن الله كان عفورًا رَحِيمًا ١٠٦ ولا تجدل

عن الذين يختاثون أنفسهم إن الله لا يُحِبُّ مَن كان خوانا أثيمًا (١٠٧) [النساء:

١٠٥، ١٠٧]

"নিশ্চয় আমরা আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষের মধ্যে ফয়সালা করেন, যা আল্লাহ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করান। আপনি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষ থেকে বিতর্ককারী হবেন না এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। যারা মনে বিশ্বাসঘাতকতা পোষণ করে তাদের পক্ষ থেকে বিতর্ক করবেন না। আল্লাহ্ পছন্দ করেন না]

একসাথে নিম্নের আয়াত পর্যন্ত নাযিল হয়:

ا فقد احتمل بهنا ومَن يكسب خطي ة أو إثمًا ثُمَّ يَرْم بِهِ بَرِي وإتما مبينا (١١٢) [النساء : ١٠٤ - ١١٢]

"যে ব্যক্তি ভুল কিংবা গোনাহ করে, অতঃপর কোনো নিরপরাধের ওপর অপবাদ আরোপ করে সে নিজের মাথায় বহন করে জঘন্য মিথ্যা ও প্রকাশ্য গুনাহ।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১০৫-১১২]

আটার নিদর্শন ও ঘরে বর্ম পাওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধারণা ছিল যে, ইয়াহূদী লোকটিই চোর। কিন্তু তাঁর ধারণার বিপরীতে অহী নাযিল হলে তিনি তা লুকিয়ে রাখেন নি; বরং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন যে, ইয়াহূদী নিরপরাধ, চোর হচ্ছে মুসলিম ব্যক্তিটি..!

ব্যাপারটি কিন্তু এতো সহজ নয়..!!

দেখুন, সাফায়ীর ঘোষণা এসেছে ইয়াহুদী ব্যক্তির পক্ষে। যে ইয়াহুদী জাতি ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করা, ষড়যন্ত্র করা, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো এবং তাঁর অনুসারীদের মাঝে ফাটল সৃষ্টিতে সদাতৎপর থাকে। এতো কিছুর পরও এসব নেতিবাচক দিক ও প্রেক্ষাপটগুলোও একজন ইয়াহূদীকে অযথা দোষারোপ করার অনুমতি দেয় না। আরো দেখুন, অভিযোগটি দাঁড়িয়েছে এক আনসারী মুসলিম ব্যক্তির বিপক্ষে। আপনি জানেন কি, কারা এ আনসার.?! তার ঐসব লোক যারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর দূরাবস্থার সময় সাহায্য করেছে, আশ্রয় ও নিরাপত্তা দিয়েছে। যারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভেতর বাহির সব। যারা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্ণধার। যাদের কাঁধের উপর দিয়েই মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের ভীত রচিত হয়েছে। কিন্তু এসব কিছুও তাদের একজন চোরের পক্ষাবলম্বন ও সাফায়ী ঘোষণার

অনুমোদন দেয় নি; যদিও প্রতিপক্ষের লোকটি একজন ইয়াহূদী। উপরন্তু এ ঘটনাটি মুসলিমদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনের জন্য ইয়াহুদীদেরকে নতুন ক্ষেত্র তৈরি করে দেবে। ইয়াহুদীরা বলে বেড়াবে যে, দেখ, মুসলিমরা হলো চোরের জাতি। তারা নিজেরা অপরাধ করে তার দায় অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়। তারা অত্যাচারীর পক্ষ অবলম্বন

করে। তারা মিথ্যা কথা বলে ইত্যাদি ইত্যাদি। এতে মুসলিম সম্প্রদায়ের চরিত্রে ধারাবাহিক কুৎসা রটনা ও কলঙ্ক লেপনে ইয়াহুদীদের জন্য এক মহা সুযোগের সৃষ্টি হয়েছে।

এতকিছুর পরও সত্যের সত্যায়ন ও ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই।

এ ঘটনায় আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য শুধু একজনের দায়মুক্তি ও অন্যজনের ওপর অভিযোগ আরোপ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এ ঘটনার মাধ্যমে তিনি উম্মতে মুসলিমাকে পৃথিবীর শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে যাবতীয় যুলুম- নির্যাতনের মূলোৎপাটনের দীক্ষা দিয়েছেন। এ লক্ষ্যে মূলনীতি ঘোষণা করেছেন যে, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে কোনো স্বার্থ লঙ্ঘন, ভৌগলিক সম্পর্ক কিংবা পার্থিব কোনো ইস্যু দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে মানুষের মাঝে সত্য ফয়সালা করতে হবে।

এর বাস্তবতাকে আরোও গভীরভাবে উপলব্ধি করার জন্য নিম্নে আরেকটি ঘটনা তুলে ধরা হলো-

জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মদীনায় এক ইয়াহূদী ছিল। সে আমাকে কর্জ দিত! আমার খেজুর পাড়ার মেয়াদ পর্যন্ত। (রাওমা নামক স্থানে পথের ধারে জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুর এক খণ্ড জমি ছিল)। একবার আমি কর্জ পরিশোধে এক বছর বিলম্ব করলাম। এরপর খেজুর পাড়ার মৌসুমে ইয়াহূদী আমার কাছে আসলো, আমি তখনো খেজুর পাড়তে পারি নি। আমি তার কাছে আগামী বছর পর্যন্ত অবকাশ চাইলাম। সে অস্বীকার করল। এ খবর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানান হলো। তিনি সাহাবীদের বললেন, চলো জাবিরের জন্য ইয়াহুদী থেকে অবকাশ নিই। তারপর তারা আমার বাগানে আসলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহূদীর সাথে এ নিয়ে কথাবার্তা বললেন। সে বল হে

আবুল কাসিম। আমি তাকে আর অবকাশ দেব না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে তার এ কথা শুনে উঠলেন এবং বাগানটি প্রদা করে তার কাছে এসে আবার আলাপ করলেন। সে এবারও অস্বীকার করল। এরপর আমি উঠে পিঠে সামান্য কিছু তাজা খেজুর নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে রাখলাম। তিনি কিছু খেলেন। তারপর বললেন, হে জাবির! তোমার ছাপড়াটা কোথায়? আমি তাকে জানিয়ে দিলাম। তিনি বললেন, সেখানে আমার জন্য বিছানা দাও। আমি বিছানা বিছিয়ে দিলে তিনি এতে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম থেকে জাগ্রত হলে আমি তার কাছে এক মুষ্টি খেজুর নিয়ে আসলাম। তিনি তা থেকে খেলেন। তারপর উঠে আবার ইয়াহূদীর সাথে কথা বললেন। সে অস্বীকার করলো। তখন তিনি দ্বিতীয়বার খেজুর বাগানে গেলেন এবং বললেন, হে জাবির তুমি খেজুর কাটতে থাক এবং কর্জ পরিশোধ কর। এ বলে, তিনি খেজুর পাড়ার স্থানে অবস্থান করলেন, আমি খেজুর পেড়ে ইয়াহূদীর পাওনা শোধ করলাম। এরপর আরও সে পরিমাণ খেজুর উদ্বৃত্ত রইল। আমি বেরিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ সুসংবাদ দিলাম। তিনি বললেন, তুমি স্বাক্ষী থাক যে, আমি আল্লাহর রাসূল।"

এটি একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা। যেখানে জাবির রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এক ইয়াহূদী থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন। ঋণ পরিশোধের সময় এসে গেছে অথচ তার কাছে ঋন পরিশোধের মত কিছু নেই। জাবির রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র সাহাবী। তাই তিনি ইয়াহূদীর নিকট এক বছরের সময় চাচ্ছেন। কিন্তু সে অস্বীকার করল এবং নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধের জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। অবশেষে জাবির রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যাপারটি জানালেন এবং তাদের মাঝে মধ্যস্থতা করে দেয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন সাহাবীকে নিয়ে জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে সুপারিশ করার জন্য ইয়াহূদীর নিকট গেলেন। কিন্তু ইয়াহূদী কোনো ভাবেই রাজি হল

না। সে বার বার একই কথা বলল যে, হে আবুল কাসিম! আমি তাকে আর অবকাশ দেব না।

এ ঘটনা ঘটেছে গোটা মদীনার একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিত্ব রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একান্ত স্নেহভাজন এক সাহাবী এবং মদীনারই আরেক সাধারণ যিম্মী ইয়াহূদী নাগরিকের সাথে। ঋণী ব্যক্তি শুধু সময় চাচ্ছেন। টালবাহানাও করছেন না আবার অস্বীকারও করছেন না। উপরন্তু স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুপারিশ করলেন; কিন্তু ইয়াহুদী মানলো না। এতকিছুর পরও আমাদের নেতা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহুদীকে সুপারিশ গ্রহণে বাধ্য করলেন না।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহূদীর দূর্বলতার দিকে তাকালেন না। জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি তাঁর স্নেহ-ভালোবাসাকেও দৃষ্টির আড়াল করে দিলেন। না তাকালেন ইয়াহূদীর অতীতের দীর্ঘ কালো ইতিহাসের দিকে। এসবের কিছুই তিনি লক্ষ্য করেন নি; বরং তিনি শুধু উত্তমভাবে ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠার দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন।

পাওনাদার একজন ইয়াহুদী। পরিশোধের সময়ও এসে গেছে। সুপারিশও প্রত্যাখ্যাত। তাই পরিশোধ করতেই হলো। রায় ইয়াহূদীর পক্ষেই গেল। যদিও তা ছিল একজন সম্মানিত সাহাবীর ছেলে সাহাবীর বিরুদ্ধে।

এটিই ইসলাম...!

এটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কৃত্রিমতা কিংবা সংযম প্রদর্শন কিছুই নয়; বরং এটি ছিল দীনের বিধানের স্বাভাবিক বাস্তবায়ন মাত্র। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يأيها الذين ءامَنُوا كونوا قومين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الولدين والأقربين إن يكن عنيا أو فقيرًا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ١٣٥) [النساء١٣٥] :

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্যদান কর, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও। কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ তাদের শুভাকাঙ্খী তোমাদের চাইতে বেশি। অতএব, তোমরা বিচার করতে গিয়ে রিপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ কর্ম সম্পর্কেই অবগত।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৩৫]

দারিদ্র্যের কারণে জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি সহানুভুতিও তার পক্ষে ইয়াহূদীর বিরুদ্ধে রায় দেওয়ার অনুমতি দেয় না। ফাতহুল কাদীরে আল্লামা শাওকানী-কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয় একথার ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, প্রতিপক্ষ যদি ধনী হয় তাহলে তার সম্পদ থেকে উপকৃত হওয়া কিংবা তার ক্ষতি থেকে বাচার জন্য তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া থেকে বিরত থাকা যাবে না। আবার যদি দরিদ্র হয় তাহলে তার প্রতি সহানুভুতি প্রদর্শন পূর্বক তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া থেকেও বিরত থাকা যাবে না।

[রেফারেন্স:বই-অমুসলিমদের প্রতি রাসুল (সাঃ) এর আচরণ]

★প্রতিবেশী অমুসলিম হলে ইসলামের নির্দেশনা

যদি কারও কোনো প্রতিবেশী কিংবা কোনো আত্মীয় অমুসলিম হয়, ইসলামের নির্দেশনা হলো- তার সঙ্গেও প্রতিবেশী বা আত্মীয়ের হক রক্ষা করে চলতে হবে। পবিত্র কোরআন ও হাদিসে এ দু'টি সম্পর্ক রক্ষা করার ওপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছে।

সাহাবি হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) বর্ণনা করেন, হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, একজন প্রতিবেশীর ওপর আরেকজন প্রতিবেশীর কী হক রয়েছে উত্তরে তিনি বললেন, 'যদি সে তোমার কাছে ঋণ চায় তাহলে ঋণ দেবে, যদি তোমার সহযোগিতা চায় তাহলে তাকে সহযোগিতা করবে, যদি সে অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে তার খোঁজখবর নেবে, তার কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে তাকে তা দেবে, সে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়লে তার খোঁজখবর নেবে, যখন সে ভালো কিছু লাভ করবে তখন তাকে শুভেচ্ছা জানাবে, যদি সে বিপদে পড়ে তাহলে সান্ত্বনা দেবে, মৃত্যুবরণ করলে তার জানাজায় শরিক হবে, তার অনুমতি ছাড়া তোমার ঘর এত উঁচু করবে না যে তার ঘরে বাতাস ঢুকতে পারে না-

কোনো ভালো খাবার রান্না করলে তাকে এর ঘ্রাণ ছড়িয়ে কষ্ট দেবে না বরং তার ঘরেও সে খাবার থেকে কিছু পৌঁছে দাও, যখন কোনো ফল কিনে তোমার বাড়িতে নেবে তখন হাদিয়াস্বরূপ তাকে সেখান থেকে কিছু দেবে, অন্যথায় সে ফল তুমি গোপনে তোমার বাড়িতে নেবে। এমন যেন না হয়, তোমার ছেলে এ ফল নিয়ে বাইরে বের হলো আর তার ছেলে তা দেখে অস্থির হয়ে পড়ল।' -ফাতহুল বারি খ. ১০, পৃ. ৫১৯

আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখার বিষয়ে নির্দেশনা তো আরও স্পষ্ট।

হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে আল্লাহ ও পরকালে ঈমান এনেছে সে যেন তার আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে। -সহিহ বোখারি ৬১৩৮

প্রতিবেশী ও আত্মীয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে চলার এই যে নির্দেশনা, তাতে মুসলিম-অমুসলিমের মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয়নি।

এমনটি বলা হয়নি- তোমার প্রতিবেশী কিংবা আত্মীয় যদি মুসলমান হয়, ধার্মিক হয়, ভালো মানুষ হয়, তাহলে তার সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে চলবে। বরং প্রতিবেশী ও আত্মীয় যেমনই হোক, ধার্মিক হোক কিংবা না হোক, এমনকি মুসলিম হোক কিংবা না হোক, তার অধিকার অকাট্য ও অনস্বীকার্য। একজন মুসলমানকে এ অধিকার রক্ষা করেই জীবনযাপন করতে হবে।

পবিত্র কোরআন ও হাদিসের কিছু নির্দেশনা এমনও রয়েছে, যেখানে সুস্পষ্ট ভাষায় অমুসলিম আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করতে বলা হয়েছে। যেমন সূরা লুকমানে বলা হয়েছে, 'পৃথিবীতে তাদের সঙ্গে সদ্ভাবে বসবাস করো। ' -সূরা লুকমান ১৫

কোরআনে কারিমের উক্ত আয়াত থেকে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়, যদি কোনো মুশরিক বাবা-মা তাদের মুসলিম কোনো সন্তানকে ইসলাম ধর্ম ছেড়ে দিয়ে আল্লাহতায়ালার সঙ্গে শিরক করতে বলে, তাহলে তাদের এ আদেশটুকু মানা যাবে না। কিন্তু এমতাবস্থায়ও তাদের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করতে হবে। বাবা-মায়ের অধিকারসমূহ আদায় করতে হবে।

প্রতিবেশীর অধিকার সম্বলিত যে সব হাদিস বর্ণিত হয়েছে, সেসবে মুসলিম-অমুসলিমের মাঝে যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি।

সাহাবাদের জীবনী থেকেও এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সাহাবি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)-এর ঘটনা। একদিন তার ঘরে একটি বকরি জবাই করা হলো। খাবার রান্না হলে তিনি তার গোলামকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাদের ইহুদি প্রতিবেশীর নিকট কি এ খাবার হাদিয়া পাঠিয়েছো?আমাদের ইহুদি প্রতিবেশীকে কি এ খাবার দিয়েছো?

এরপর তিনি বললেন, আমি হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, প্রতিবেশীর বিষয়ে জিবরাইল আমাকে এত উপদেশ দিচ্ছিল, আমি মনে করছিলাম- সে হয়তো তাদেরকে ওয়ারিশই বানিয়ে দেবে। ' -সুনানে তিরমিজি ১৯৪৩

মনে রাখতে হবে আমাদের কোনো কাজেকর্মে যেন অমুসলিম প্রতিবেশীও কষ্ট না পায়। কারণ হজরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কিয়ামত দিবস এবং আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনে, তার উচিত প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেওয়া। (বুখারি শরিফ, হাদিস নং ৬০১৮)।

★প্রতিবেশী অমুসলিম ও অসুস্থ হলে সেবা করা যাবে কি?

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ জীবনে সব ধর্ম বর্ণ ও গোত্রের মানুষই এক সঙ্গে বসবাস করে। তাই কোনো মুসলিম ব্যক্তির প্রতিবেশি যদি অমুসলিম হয়, তার অধিকারের প্রতিও খেয়াল রাখা জরুরি। এটিও প্রতিবেশীর হকের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলার ঘোষণা-'দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের নিজেদের দেশ থেকে বের করে দেয়নি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেননি। আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।' (সুরা মুমতাহিনা : আয়াত ৮)

তাই কোনোভাবেই অমুসলিম প্রতিবেশির অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ বা জুলুম করা যাবে না। আবার কোনো অমুসলিম প্রতিবেশি অসুস্থ হলে তার সেবা করাও ইসলামে নিষেধ নয়। কোনো অমুসলিমের প্রতি জুলুম করার অধিকার বা অনুমতি ইসলাম কাউকেই দেয়নি। হাদিসে এসেছে-রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারো ওপর জুলুম করতে নিষেধ করেছেন, যদিও মজলুম অমুসলিম হয়। তিনি বলেন, 'তোমরা মজলুমের বদদোয়া থেকে বেঁচে থেকো, যদিও সে কাফির হয়। তার মাঝখানে

আর আল্লাহর মাঝখানে কোনো পর্দা থাকে না। অর্থাৎ তার বদদোয়াও দ্রুত কবুল হয়ে যায়।' (মুসনাদে আহমাদ)

বিভিন্ন সময় এমন অনেক প্রশ্ন শুনতে হয় যে, অমুসলিম প্রতিবেশি যদি অসুস্থ হয় তবে তাকে দেখতে যাওয়া বা তার সেবা করা যাবে কিনা? হ্যাঁ, অমুসলিম প্রতিবেশি যদি অসুস্থ হয় তবে তাকে সহযোগিতা করা বা সেবা-যত্ন করায় ইসলামে কোনো বাঁধা নেই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অমুসলিম অসুস্থ প্রতিবেশিকে দেখতে গেছেন মর্মে হাদিসেই এর প্রমাণ রয়েছে।

অমুসলিম রোগীকে দেখতে যাওয়াও সুন্নত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অমুসলিম রোগীদের দেখতে যেতেন এবং তাদের ঈমানের দাওয়াত দিতেন। তাদের সেবা করতেন। হাদিসে এসেছে-

হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন এক ইয়াহুদি গোলাম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমত করত। যখন সে অসুস্থ হলো, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখতে গেলেন, তার মাথার দিকে বসলেন আর তাকে বললেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ করো! তখন সে তার পিতার দিকে দেখল। পিতা বললেন, তুমি আবুল কাসেমের অনুসরণ করো। ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করল। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বলে বের হলেন- আল্লাহর শুকরিয়া যে, যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন।' (বুখারি)

সুতরাং কোনো অমুসলিম প্রতিবেশি যদি অসুস্থ হয় বা বিপদাপদে পড়ে তবে তার সেবা-যত্ন বা সুস্থতায় কিংবা সহযোগিতায় এগিয়ে যাওয়া প্রত্যেক প্রতিবেশির নৈতিক দায়িত্ব। অসুস্থতার সময় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করাই ইসলামের সুমহান শিক্ষা।

তাই কোনো অমুসলিম প্রতিবেশি অসুস্থ হলে কিংবা বিপদে পড়লে তাকে দেখতে যাওয়া, তার সেবা-যত্ন করার কেউ না থাকলে তাকে সেবা করা ইসলামে নিষেধ নয়। বরং শরিয়তের হুকুম রক্ষা করে, পর্দার হুকুম থাকলে তা মেনেই অমুসলিম প্রতিবেশি,

অসুস্থ ব্যক্তি কিংবা বিপদে পড়া প্রতিবেশির সহযোগিতায় এগিয়ে যাওয়ায় কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।

★অমুসলিমদের সঙ্গে যেমন ছিলেন নবীজি (সাঃ)

মানবতার নবী ও বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) তার উম্মতকে সদা এই নির্দেশই দিয়েছেন তারা যেন ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী নির্বিশেষে সবার সঙ্গে উত্তম আচরণ করে। মহানবীর (সা.) অতুলনীয় জীবনাদর্শ থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখলেই আমরা সহজেই বুঝতে পারবো অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে তার ব্যবহার কেমন ছিল।

হজরত আবুবকর (রা.)এর কন্যা আসমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মহানবীর (সা.) যুগে আমার অমুসলিম মা আমার কাছে এলেন। আমি মহানবীকে (সা.) জিজ্ঞেস করলাম- আমি কি তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করব?
তিনি (সা.) বললেন, হ্যা' (সহিহ বোখারি)। হজরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, 'একদা এক বেদুঈন মসজিদে পেশাব করলো। লোকেরা উঠে (তাকে মারার জন্য) তার দিকে গেল। মহানবী (সা.) বললেন, তার পেশাব বন্ধ করো না। তারপর তিনি (সা.) এক বালাতি পানি আনলেন এবং পানি পেশাবের ওপর ঢেলে দেয়া হল' (সহিহ বোখারি, কিতাবুল আদ)

অমুসলিমদের সঙ্গে ওঠাবসা ও কথাবার্তা বলা বৈধ। এমনকি প্রয়োজনে তারা মসজিদে বসারও অনুমতি আছে। যখন সাকিফ গোত্রের প্রতিনিধি রসুল সা.-এর দরবারে হাজির হয়েছে, তখন তারা মসজিদের শেষে গম্বুজের কাছে অবস্থান করে।

যখন নামাজের সময় হলো, দলের একজন লোক বলল, হে আল্লাহর রসুল, নামাজের সময় হয়েছে। এরা একদল অমুসলিম, তারা মসজিদে আছে। তখন রসুল সা. বলেন, 'অমুসলিমদের কারণে জমিন নাপাক হয় না।' (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা ৮৫৭৬)

মহানবীর (সা.) আদর্শ এতটাই অতুলনীয় ছিল যে তিনি ইহুদীর লাশকেও সম্মান দেখিয়েছেন। হাদিসে উল্লেখ রয়েছে, একবার এক ইহুদীর লাশ বিশ্বনবীর (সা.) সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল আর এতে মহানবী (সা.) সেই লাশের সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে ছিলেন ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না লাশটি তার সামনে থেকে চলে যায়।

পাশ থেকে হজরত জাবের (রা.) বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসুল! এটি তো ইহুদীর লাশ। এতে আল্লাহর রাসুল উত্তর দিয়েছিলন, সে কি মানুষ ছিল না? (সহিহ বোখারি, হাদিস নং ১৩১১)।

যে নবী এক ইহুদীর লাশকে সম্মান জানানোর জন্য তার সাথিদেরকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন সেই নবীর উম্মতের পক্ষে কিভাবে সম্ভব শুধু ধমীর্য় মতপার্থক্যের কারণে কারো ওপর অন্যায় অত্যাচার করা!

হজরত সুফিয়ান ইবনে সালিম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'মনে রেখো যদি কোনো মুসলমান অমুসলিম নাগরিকের ওপর নিপীড়ন চালায়, তার অধিকার খর্ব করে, তার কোনো বস্তু জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়, তাহলে কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহর আদালতে তার বিরুদ্ধে অমুসলিম নাগরিকদের পক্ষাবলম্বন করব' (আবু দাউদ)।

হজরত আবু বাকারা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোনো অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন' (মুসনাদে আহমদ)। এছাড়া মহানবী (সা.) এটিও বলেছেন, 'তোমরা মজলুমের বদদোয়া থেকে বেঁচে থেকো, যদিও সে কাফির হয়। তার মাঝখানে আর আল্লাহর মাঝখানে কোনো পর্দা নেই (অর্থাৎ তার বদদোয়া দ্রুত কবুল হয়ে যায়)' (মুসনাদে আহমদ)।

মানব সেবায় আত্মনিয়োগকারী ব্যক্তির প্রতিও মহানবী (সা.) শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন ও তাদের খেয়াল রাখতেন। একবার তাঈ গোত্রের লোকেরা মহানবীর (সা.) বিরুদ্ধে যুদ্ধ

করেছিল। এতে তাদের কিছু সংখ্যক লোক বন্দী হয়ে এসেছিল। তাদের মধ্যে আরবের প্রসিদ্ধ দাতা হাতেমের এক মেয়েও ছিল। যখন সে মহানবীর (সা.) কাছে বললো, সে হাতেম-তাঈর মেয়ে, এ কথা শুনে মহানবী (সা.) তার সঙ্গে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে ব্যবহার করলেন এবং তার সুপারিশক্রমে তার গোত্রের শাস্তি ক্ষমা করে দিলেন' (সীরাত হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ-২২৭)।

আমরা যদি সেই সময়ের ঘটনা লক্ষ্য করি যখন মক্কার লোকেরা মহানবীর (সা.) কোন কথাই যখন শুনতে চাচ্ছিল না, তখন তিনি (সা.) তায়েফের দিকে দৃষ্টি দিলেন। যখন তিনি (সা.) তায়েফ পৌছলেন, তখন সেখানকার নেতৃবৃন্দ তার সাথে দেখা করার জন্য আসতে লাগলো। কিন্তু কেউই সত্য গ্রহণ করতে রাজী হলো না। সাধারণ লোকেরাও তাদের নেতাদেরই অনুসরণ করল এবং খোদার বাণীর প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করতে লাগলো। পরিশেষে তারা সব ভবঘুরে ছেলে ছোকরাদেরকে একত্রিত করলো। তারা প্রত্যেকেই ঝোলা ভর্তি পাথরের টুকরা নিল। তারা নির্মমভাবে মহানবীর (সা.) ওপর পাথর ছুঁড়তে থাকে।

অবিশ্রান্তভাবে পাথর মারতে মারতে মহানবীকে (সা.) শহর থেকে বাইরে নিয়ে গেল। শ্রেষ্ঠ রাসুলের দু'টি পা রক্তাক্ত হয়ে উঠলো। তারপরও তারা ঠান্ডা হলো না, যতক্ষণ না তিনি (সা.) শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে একটি পাহাড়ে এসে পৌছলেন। এই লোকগুলো যখন তার পিছু পিছু ধাওয়া করছিল, তখন তিনি এই ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিলেন যে, আল্লাহর গজব না আবার তাদের ওপর পড়ে।

তিনি আকাশের দিকে মুখ তুলে দেখছিলেন এবং কাতর প্রাণে প্রার্থনা করছিলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি এদেরকে ক্ষমা করে দাও! কেননা এরা জানে না, এরা কি করছে।' একটু ভেবে দেখুন, আঘাতে জর্জরিত ও লোকদের তাড়া খেয়ে তার শরীরে চলার মত আর শক্তি ছিল না। এত কিছুর পরও তিনি (সা.) তাদের অভিশাপ দেননি বরং তাদের জন্য দোয়াই করেছেন।

এমনই ছিলো মানবদরদী রাসুল, শ্রেষ্ঠ রাসুল মহানবীর (সা.) আদর্শ। আমরা যদি মহানবীর (সা.) জীবনাদর্শ পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখতে পাই, তিনি কতইনা উত্তম আচরণ করেছেন অন্যান্যা ধর্মাবলম্বীদের সাথে আর একই শিক্ষা আমাদেরকে দিয়ে গেছেন। তিনি (সা.) যে দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

★অমুসলিমদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বানের পদ্ধতি

মানুষকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়ার গুরুত্ব ও মর্যাদা:

মহান আল্লাহ বলেন:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

"হেকমত (জ্ঞান ও প্রজ্ঞা) ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তোমার রবের পথে আহবান কর। আর সর্বোত্তম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর। আপনার রব তো সবচেয়ে বেশি জানেন কে তার পথ থেকে বিচ্যুত এবং তিনিই ভাল জানেন কে হেদায়েত প্রাপ্ত। (সূরা নাহলঃ ১২৫)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ

"তোমার মাধ্যমে যদি আল্লাহ একজন লোককেও হেদায়েত দেন তবে তা তোমার জন্য একটি লাল উট পাওয়া থেকেও উত্তম।" (বুখারী ১২/৩৭)

তিনি আরে বলেন:

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا

“যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে আহবান করে সে ঐ পরিমাণ সওয়াবের অধিকারী হয় যে ব্যক্তি তদনুযায়ী আমল করে। কিন্তু এতে আহ্বানকারীর সওয়াব কমানো হয় না।”

❒ অমুসলিমকে দাওয়াত দেয়ার ১০টি পদ্ধতি:

○ ১. যার নিকট ইসলামের দাওয়াত দিতে চান নিজেকে তার সামনে আদর্শ মুসলিম হিসেবে ফুটিয়ে তোলা। একজন দাঈ সকল অবস্থায় তার আচার-ব্যবহার কথা-বার্তা, ইবাদত-বন্দেগি ইত্যাদি বিষয়ে আদর্শবান হবেন। কারণ আদর্শবান ব্যক্তিত্ব ও সুন্দর ব্যবহার মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বানের ক্ষেত্রে খুব বেশি অবদান রাখে।

○ ২. দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে জ্ঞান, প্রজ্ঞাপূর্ণ সুন্দর ও নম্র ভাষা ব্যবহার করা এবং বিতর্কের প্রয়োজন হলে দলীল-প্রমাণ ও যৌক্তিক পদ্ধতিতে বিতর্ক করা।

○ ৩. যাকে দাওয়াত দিবেন তার চিন্তা-ভাবনা, সংশয়, মতবাদ, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি সম্পর্কে যথাসম্ভব জানার চেষ্টা করা এবং সে আলোকে তার সাথে কথা বলা।

○ ৪. সবার আগে তার হৃদয়ে তাওহীদ-একত্ববাদ ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের বীজ বপন করা। মহান আল্লাহ আমাদের স্রষ্টা এবং জীবন ও মৃত্যু দাতা। ভালো কাজ করলে তিনি পরকালে আমাদেরকে পুরস্কৃত করবেন এবং খারাপ কাজের প্রতিদানে শাস্তি প্রদান করবেন।

এছাড়াও ইসলামের অন্যান্য আকীদা ও বিশ্বাসের মৌলিক বিষয়গুলো তার হৃদয়পটে প্রথিত করা।

○ ৫. ধৈর্য ধারণ করা। সময়, শ্রম, তার অনাগ্রহ, অভদ্র আচরণ ইত্যাদির ক্ষত্রে ধৈর্যের পরিচয় দেয়া। তাড়াহুড়া ফল লাভের আশা করা ঠিক নয়। আপনার আজকের দাওয়াত হয়ত বহু দিন পর তার হৃদয়কে আলোড়িত করবে। তাই দাওয়াত অব্যহত রাখতে হবে। কোনভাবেই হতাশা অনুভব করা যাবে না। বরং দীর্ঘ মেয়াদী চিন্তা সামনে রেখে সবরের পরিচয় দেয়া জরুরি।

○ ৬. তাকে কুরআন পড়ার জন্য উৎসাহিত করা। প্রয়োজনে তাকে কুরআনের তরজমা ও তাফসীর উপহার দেয়া।

○ ৭. তার সামনে ইসলামের সৌন্দর্যময় দিকগুলো ফুটিয়ে তোলা। অন্যের ধর্ম বা মতবাদের বদনামের চেয়ে তার কাছে ইসলামের সৌন্দর্যময় দিকগুলো তুলে ধরা অধিক প্রলপ্রসূ।

○ ৮. দাওয়াতের স্বার্থে যাকে দাওয়াত দিতে চান তার সেবা ও সমস্যা সমাধানে নিজের সময়, শ্রম, মেধা ও যথাসম্ভব অর্থ খরচ করা।

○ ৯. তার জন্য ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের উপায়-উপকরণগুলো সহজলভ্য করা। যেমন কিছু ভালো বই পড়তে দেয়া বা ভালো ওয়েব সাইট, ভিডিও ক্লিপ ইত্যাদিগুলো সরবরাহ করা।

○ ১০. তার হেদায়েতের জন্য মহান আল্লাহর নিকট দুআ করা।

মনে রাখতে হবে, আল্লাহই প্রকৃত হেদায়েতের মালিক। তিনি যাকে ইচ্ছা আলোকিত পথের সন্ধান দেন। আমাদের কাজ কেবল দ্বীনের দিকে আহ্বান জানানো এবং এ পথে যথাযথভাবে পরিশ্রম করা এবং ফলাফল একমাত্র আল্লাহর উপর সমর্পন করা।

★উপসংহার

ইসলাম সর্বত্র শান্তি স্থাপন করতে চায়। তাই মুসলিম অমুসলিম নিয়ে একটি শান্তিময় জগত গড়ার প্রত্যয়ে ইসলাম বিভিন্ন জনের সাথে,বিভিন্ন গোত্র ও সম্প্রদায়ের সাথে গভীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছে, যা ইসলামের উদারতার বহিঃপ্রকাশ।

বাহ্যিক সদাচার ও সৌজন্যের ক্ষেত্রে অমুসলিমদের কোন শ্রেণীবিভেদ নেই।
অমুসলিমদের সাথে ইসলামের সৌহার্দপূর্ণ আচরণের অসংখ্য নমুনা রয়েছে।ইসলাম কখনোই কোনো অমুসলিমের উপর জুলুম করার নির্দেশ দেয় না।
সুন্দর আচরণও দাওয়াহ হিসেবে কাজ করে।অন্তর গলানো আচরণও অমুসলিমদেরকে ইসলামের সৌন্দর্য বুঝিয়ে এক আল্লাহর অনুগত বান্দা হয়ে উঠতে সাহায্য করে।